বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং দেশের মানুষের চোখে

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

| ঢাকা , শুক্রবার, ২৪ মে ২০১৯

আগেই বলে রাখছি আজকের লেখাটি পড়ে কারও কারও মন খারাপ হতে পারে। শুধু মন খারাপ নয়, কেউ কেউ বিরক্ত হতে পারেন- এমনকি রাগও হতে পারেন। তবে আমি যেহেতু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতির মাঝে প্রায় দুই যুগ কাটিয়ে দিয়েছি তাই আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি যেটি হয়তো বাইরের একজন দেখেও বুঝতে পারবে না। তাই মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতি নিয়ে কিছু একটা লেখার ইচ্ছা করে।

মনে আছে, বেশ কয়েক বছর আগে আমি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বলেছিলাম, আমাদের দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসলে মৃত্যু পথযাত্রী, সেটা জেনে-শুনেও আমরা তার হাত ধরে বসে আছি, শুধু তার মৃত্যুযন্ত্রণা একটু খানি কমানোর জন্য। আমি জানি এটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর একটা বক্তব্য, অনেক দুঃখে এ রকম একটা বক্তব্য দিয়েছিলাম। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, আমি যদি এখন নিজেকে সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি তাহলে আমি কী উত্তর দেব? পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের

সেই ভয়ঙ্কর দুঃসময় কি কেটে গেছে? এখন কি আমরা বলতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সত্যিকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে।

প্রথমেই দেখি আমাদের বিশ্ববিদ্যায়গুলো সম্পর্কে বাইরের পৃথিবী কী বলে? কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম, সেখানে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আমাকে ভয়াবহ একটা তথ্য দিয়েছে। আমাদের দেশের দুই একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্নাতক ডিগ্রিটাকেও তারা স্বীকার করে না। সেটাকে একটা ডিপ্লোমার সমান ধরে নেয়। কী লজ্জার কথা। এই লজ্জার জন্য নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক দায়ি না- এর জন্য দায়ী হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল, সেই তথ্য পাঠানো হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে আমরা কেউ একজন সেই তথ্য পাঠিয়ে দিলে হবে না। যাদের দায়িত্ব তাদের পাঠাতে হবে এবং শুধু এ কথায় পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলে হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি না হচ্ছে ততক্ষণ এর পেছনে লেগে থাকতে হবে। দরকার হলো অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশ হাইকমিশনকে এর জন্য একটু কাজ করতে অনুরোধ করতে হবে। সেগুলো করা হয়নি।

শুধু যে অস্ট্রেলিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়াকে কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না তা নয়, সারা পৃথিবীর র‍্যাংকিংয়েও প্রথম কয়েক হাজারের

মাঝে আমাদের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। সেটা নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে বলে শুনেছি। আমাদের দেশে দুটি ভিন্ন জগৎ রয়েছে একটি হচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ার ভার্চুয়াল জগৎ আরেকটি হচ্ছে পত্রপত্রিকা এবং টেলিভিশনের বাস্তব জগৎ। আমি সজ্ঞানে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভার্চুয়াল জগৎ থেকে দূরে থাকি তাই সেখানকার তাপ-উত্তাপ টের পাই না। সেই তাপ-উত্তাপের ছিটেফোঁটা যখন খবরের কাগজে এসে হাজির হয় তখন আমি সেটা জানতে পারি। এবারেও তাই, অনেকদিন পর যখন পরিচিত সাংবাদিকরা এ বিষয়ে আমার মতামত জানতে চাইতে শুরু করেছে তখন আমি এ র‍্যাংকিং নিয়ে হইচইয়ের কথা জানতে পেরেছি।

১৬ কোটি মানুষের দেশের সবচেয়ে ভালো ছেলেমেয়েরা সারা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো ছেলেমেয়ে, শিক্ষকেরা সারা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো শিক্ষক। কাজেই তারা যে ইউনিভার্সিটির ছাত্র এবং শিক্ষক সেই ইউনিভার্সিটিগুলো পৃথিবীর প্রথম কয়েক হাজারের ভেতর নেই এই তথ্যটি কোনভাবেই সঠিক তথ্য নয়। কিন্তু যেহেতু র‍্যাংকিংয়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বুঝতে হবে কোথাও আমরা কিছু গোলমাল করেছি। অনুমান করছি কোন এক ধরনের র‍্যাংকিংয়ে বিবেচিত হতে হলে যে প্রক্রিয়ায় সেই তথ্য পাঠাতে হয় আমরা নিশ্চয়ই সেভাবে সেই তথ্য পাঠাইনি তাই আমরা বিবেচনার মাঝেই আসছি না। যেহেতু সারা দেশে এটা নিয়ে হইচই হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

মুখ কাচুমাচু করে নানা রকম কৈফয়ত দিয়ে যাচ্ছে তাই আমি মনে করি এখন সময় হয়েছে আমাদের র‍্যাকিংয়ে অবস্থানগুলো জানার। প্রতি বছর সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ছাত্রছাত্রীরা আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সেই প্রথম ১০০ থেকে ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে আমাদের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিতভাবে অংশ নিচ্ছে। কাজেই আমরা সারা পৃথিবীর মাঝে নিজেদের র‍্যাংকিং নিয়ে হীনমন্যতায় ভুগব সেটা তো হতে পারে না। তবে আমি খুব মজা পেতাম যদি দেখতাম আমাদের বিশ্ববিদ্যলয়গুলো বুক ফুলিয়ে বলতো, ‘আমরা এই র‍্যাংকিংয়ের থোড়াই কেয়ার করি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অমুক অমুক গবেষক নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, প্রতি বছর এত হাজার পেপার প্রথম শ্রেণীর জার্নালে প্রকাশিত হয়, এতগুলো পেটেন্ট ফাইল করা হয়। অমুক অমুক শিক্ষক আন্তর্জাতিক মানের তারা অমুক অমুক জার্নালের এডিটরিয়াল বোর্ডের সভাপতি, প্রতি বছর আমাদের এত হাজার পিএইচডি বের হয়, এতগুলো দেশ থেকে এতজন ছাত্রছাত্রী নিয়মিতভাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এতগুলো হাইটেক কোম্পানি স্পিন অফ করে বের হয়েছে, এখন তারা এত বিলিয়ন ডলারের কোম্পানি, সেখানে এতজন গবেষক ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে ইত্যাদি ইত্যাদি।’ দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এগুলো কিছুই বলতে পারছি না তাই সোশ্যাল মিডিয়া এবং খবরের কাগজে গালমন্দ অপমান সহ্য

করতে হচ্ছে। (আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্চ ইঞ্জিন সংক্রান্ত একটা কোম্পানি স্পিন অফ করে বের করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সরাসরি না করে দিয়েছে। যখন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে তারা জানিয়েছে আগে যেহেতু কখনও এ ধরনের কিছু করা হয়নি তাই তারা কিছুই বলতে পারছে না। যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি গুগল হচ্ছে স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে স্পিন অফ করা একটি কোম্পানি। সারা পৃথিবীতে যেটাকে সাফল্য হিসেবে দেখা হয় আমাদের দেশের সেটাকে এখনও একটা দুই নম্বরী কুমতলব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কাজেই পৃথিবীর সমান সমান চিন্তাধারায় পৌঁছাতে আমাদের আরও বেশকিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। তারপর না হয় র‍্যাংকিং নিয়ে মাথা ঘামাব)।

যাই হোক, দেখাই যাচ্ছে বাইরের পৃথিবীর সামনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধর্তব্যের মাঝেই নেই, কিন্তু আমাদের নিজেদের মূল্যায়ন কী? একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বসময় হর্তাকর্তা হচ্ছেন ভাইস চ্যান্সেলর। তাদের কী পরিমাণ ক্ষমতা সেটি বাইরের মানুষের পক্ষে কল্পনা করা পর্যন্ত সম্ভব নয়। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করার জন্য নানা ধরনের কমিটি থাকে কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলররা চাইলে সেগুলো এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন যে সেই কমিটির কেউ মুখ পর্যন্ত খুলতে সাহস পাবেন না। যে একাডেমিক কাউন্সিল শেষ হলে রাত দুপুর হয়ে যেতো

সেগুলো আধঘণ্টায় শেষ হয়ে যায় সেরকম উদাহরণও আছে।

যেহেতু একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালোমন্দ, লেখাপড়া, গবেষণা ভবিষ্যৎ একজন ভাইস চ্যান্সেলরের ওপর সাংঘাতিকভাবে নির্ভর করে তাই মোটামুটি ঢালাওভাবে বলে দেয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলরদের যদি ঠিকভাবে নিয়োগ দেয়া হয় তাহলে সেগুলো ভালোভাবে চলবে। এখন প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলরদের কী ঠিকভাবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে?

আমি নিজের কানে শোনা দুজন ভাইস চ্যান্সেলরের দুটি উক্তির কথা বলি, একজন সরাসরি আমাকে বলেছেন, 'যদি কোন ভাইস চ্যান্সেলর দাবি করে সে কোন ধরনের লবিং না করে ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছে তাহলে বুঝতে হবে হি ইজ এ ড্যাম লায়ার (সে হচ্ছে চরম মিথ্যাবাদী।)' আরেকজন ভাইস চ্যান্সেলর দায়িত্ব নেয়ার পর তার আগের ভাইস চ্যান্সেলর সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমপক্ষে ৩০ কোটি টাকা নিয়ে গেছেন!' শুনে আমার চোখ কপালে উঠে গেছে।

কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝেন, আমি মোটেও দাবি করছি না আমাদের সব ভাইস চ্যান্সেলর এ রকম। কিন্তু আমি অবশ্যই যথেষ্ট ক্ষোভের সঙ্গে বলছি, যদি একজন ভাইস চ্যান্সেলরও এ রকম হয় আমি সেটাও মানতে রাজি নই। অন্য সব পেশায় মানুষ এ রকম হতে পারে কিন্তু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয় তার সর্বময় দায়িত্বে যাঁরা থাকবেন তিনি এ রকম হতে পারবেন না।

আমি অবশ্য আমার জীবনে একজন অসাধারণ ভাইস চ্যান্সেলর পেয়েছিলাম। তিনি প্রফেসর মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গুন্ডামি করার কারণে ছাত্রলীগের ছেলেদের শাস্তি দেয়ার অপরাধে তারা আমাকে এবং তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছিল। দেখতে ছোটখাটো কিন্তু দুঃসাহসী মানুষ ছিলেন। কখনও কোন চাপের মুখে মাথা নোয়াতেন না। যাই হোক একবার কোন একটি একাডেমিক কাউন্সিলে তার সঙ্গে আমার তুমুল তর্কবিতর্ক ঝগড়া হলো, (আমরা শিক্ষকেরা একাডেমিক বিষয় নিয়ে অনেক ঝগড়াঝাটি করতাম)। একাডেমিক কাউন্সিল শেষ হওয়ার পর আমি বের হয়ে ফিরে যাচ্ছি তখন বিএনপি-জামায়াতপন্থি একজন শিক্ষক আমার কাছে এসে গলা নামিয়ে বললেন, 'আপনি চালিয়ে যান, আমরা আপনার সাথে আছি।'

আমি কয়েক সেকেন্ড তার দিকে হা করে তাকিয়ে রইলাম তারপর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ভাইস চ্যান্সেলর হাবিবুর রহমানের কাছে ফিরে এলাম। তাকে বললাম, 'স্যার, আমি আপনার সঙ্গে অনেক ঝগড়াঝাটি করেছি, ভবিষ্যতে মনে হয় আরও করব। কিন্তু স্যার আপনাকে বলতে এসেছি আমি আপনাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি। এই ঝগড়াঝাটি করি বলে কিন্তু মনে করবেন না আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এতটুকু কমবে।

আমি কী করব না করব সব আপনাকে দেখে ঠিক করি।’

প্রফেসর হাবিবুর রহমানের চোখ মুহূর্তের জন্য অশ্রুসজল হয়ে গিয়েছিল, আমার মনে হলো, ভাগ্যিস আমি তার ভুল ভাঙাতে ফিরে এসেছিলাম। আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ হয়ে গেছে, এ রকম অনেক মিষ্টি মধুর স্মৃতি নিয়ে পরের জীবনে ফিরে যাব, চিন্তা করেই ভালো লাগে।

যাই হোক আন্তর্জাতিকভাবে র‍্যাংকিংয়ে বিবেচিত হবার আগে আমরা কী জিজ্ঞেস করতে পারি দেশের সাধারণ মানুষ তাদের কীভাবে র‍্যাংকিং করবে? প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষার সময় এ দেশের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের এবং তাদের অভিভাবকদের কী পরিমাণ কষ্ট করতে হয় সেটা জানতে দেশের কোন মানুষের বাকি নেই। এই কষ্টটুকু শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশাসকরা মানতে পারেননি; কিংবা জানতে পারলেও অনুভব করতে পারেননি। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের এই কষ্টটুকু বুঝতে পেরেছেন এবং অনেকবার সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে তাদের কষ্টটুকু লাঘব করার কথা বলেছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তার কথায় কর্ণপাত করেননি। কাজেই এই দেশের ছেলেমেয়ে এবং তাদের অভিভাবকদের বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ের দায়িত্ব দেয়া হলে তারা যে র‍্যাংকিংয়ে খুব উঁচু স্থান দেবে সেটি মনে হয় না।

২.

এতক্ষণ পর্যন্ত ক্রমাগত নেতিবাচক কথা বলে এসেছে, কিন্তু এ রকম মন খারাপ করা কথা বলে লেখাটা শেষ করতে মন চাইছে না, কোন একটা ভালো কথা কথা বলে লেখাটি শেষ করতে চাই।

কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে দেখেছি আমাদের দেশের আটটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মিলে সম্মিলিতভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খবরটি পড়ে আমার বুকটি আনন্দে ভরে গেছে। মনে হয়েছে এই দেশে অন্তত আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আটজন ভাইস চ্যান্সেলর আছেন যারা তাদের শিক্ষকদের নিয়ে এই অসাধারণ কাজটি করতে রাজি হয়েছেন। এই ভাইস চ্যান্সেলর শিক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দেশের সাধারণ ছেলেমেয়েদের জন্য ভালোবাসা রয়েছে। কী চমৎকার একটি ব্যাপার।

আমি কীভাবে তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করব বুঝতে পারছি না। যদি সামনা সামনি গিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ কখনও নাও পাই তারপরেও তাদের জন্য রইল আন্তরিক ভালোবাসা। শুধু আমার নয় এই দেশের লাখো লাখো ছেলেমেয়ে এবং তাদের অভিভাবকদের কৃতজ্ঞতাটুকু নিশ্চয়ই তারা অনুভব করবেন।

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, তিনি সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় মিলে সমন্বিত একটি ভর্তি পরীক্ষা দেখতে চান। আমরা সবাই জানি আগে হোক পরে হোক সবাইকেই এ পথে আসতে হবে, কিন্তু সবার আগে পথ প্রদর্শনের এ সম্মানটুকু

বাংলাদেশের আটটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই থেকে যাবে।
দেশের মানুষের র‍্যাংকিংয়ে তারা এখন সবার উপরে।